# “রহমান ‘আরশের উপর উঠেছেন”

কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ভাষ্যের আলোকে আল্লাহ্‌র ‘আরশের উপর উঠা, সবকিছুর উপরে থাকা, সাথে থাকা ও নিকটে থাকার সিফাত তথা গুণ বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদাহ


**গ্রন্থনা**

**প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া**

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।



Publications

**প্রকাশনা**

**কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (সিডব্লিউআই)**

৩৯/১ মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর, মোবাইল: +৮৮০১৫৭৫৫৪৭৯৯৯

**ILM Publications**

92-23 176th Street, 1st Floor, Jamaica, New York 11433, USA,
Phone: 718 2918712, 347 4882777
Email: ilmpublicationsinc@gmail.com, Web: ilmpublication.com

**প্রথম প্রকাশ:** সেপ্টেম্বর ২০২০
**দ্বিতীয় সংস্করণ:** মার্চ ২০২১

**পরিবেশনা**

**কাশফুল প্রকাশনী**

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯

অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com, www.wafilife.com

© গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অঙ্গসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, +৮৮ ০১৭১৫৭৬৪৯৯৩
প্রচ্ছদ: আরিফুর রহমান, কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা- +৮৮ ০১৮১৯১৮১৪৯২

মূল্য: ৭২০ (সাত শত বিশ) টাকা / USD 15 $

**ISBN: 978-984-34-8360-7**

RAHMAN ARSHER UPOR UTHECHEN [The Merciful Lord has ascended on His Throne] by Professor Dr. Abu Bakar Md. Zakaria. Published by Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Bangladesh and ILM Publications, New York 11433, USA.

# সূচীপত্র


প্রকাশকের কথা ---------- ১৪
ভূমিকা ---------- ১৫

**প্রথম অধ্যায়:**
**আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকীদাহ** ---------- ২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ: "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ---------- ২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি ---- ২৭
আল্লাহর নামের ব্যাপারে নীতিমালাসমূহ ---------- ২৭
আল্লাহর মহান গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি ---------- ২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত
ফেরকাসমূহের নীতি ---------- ৩১

**দ্বিতীয় অধ্যায়:**
**'আরশ ও কুরসী সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ** ---------- ৩৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: 'আরশ পরিচিতি ---------- ৩৯
'আরশের দলীল-প্রমাণ ---------- ৪০
'আরশের কিছু বৈশিষ্ট্য ---------- ৪১
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বাইরে অবস্থানকারীদের 'আরশের ব্যাপারে অভিমত ----- ৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরসী সংক্রান্ত আলোচনা ---------- ৬১
কুরসীর কিছু বৈশিষ্ট্য ---------- ৬১
কুরসীর ব্যাপারে বিভিন্ন ভুল মতামত ---------- ৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ সবকিছুর উপরে থাকা এবং 'আরশের উপর উঠা ---------- ৬৬

**তৃতীয় অধ্যায়:**
**আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" তথা 'আরশের উপর উঠার প্রমাণ** --------- ৬৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" এর ওপর কুরআন থেকে দলীল ---------- ৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" এর ওপর হাদীস থেকে দলীল ---------- ৭১

**চতুর্থ অধ্যায়:**
**ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ** ---------- ৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: আভিধানিক ও ব্যবহারবিধি অনুযায়ী ইস্তেওয়া এর অর্থ ---------- ৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআনের অন্যত্র 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ উপরে উঠা ---------- ৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সত্তা অনুসারে গুণ হয়ে থাকে ---------- ৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: "ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র মৌলিক দিকসমূহ ---------- ৮২

**পঞ্চম অধ্যায়:**

**'আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা' ও 'আরশের উপরে থাকা' এর সপক্ষে আরও কিছু পরোক্ষ প্রমাণ** ---------- ৮৭

প্রথম পরিচ্ছেদ: কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকার উপর প্রমাণসমূহ ---------- ৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপরে থাকার প্রমাণসমূহ ---------- ৯৭

**ষষ্ঠ অধ্যায়:**

**সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে তাবে'য়ীন ও পরবর্তী সালাফে সালেহীনের বক্তব্য থেকে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশে'র অর্থ ও তা সাব্যস্তকরণ** ---------- ১৪১

**প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য** ---------- **১৪১**

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (১৩ হিজরী) ---------- ১৪১

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (২৩ হিজরী) ---------- ১৪১

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৮ম হিজরী) ---------- ১৪২

উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা (২১ হিজরী) ---------- ১৪৩

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩২ হিজরী) ---------- ১৪৩

আবু যর জুনদুব ইবন জুনাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩২ হিজরী) ---------- ১৪৬

উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩৪ হিজরী) ---------- ১৪৬

হাসসান ইবন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩৫-৪০ হিজরীর মাঝে) ---------- ১৪৬

'ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫২ হিজরী) ---------- ১৪৮

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৫ হিজরী) ---------- ১৪৮

উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা (৫৮ হিজরী) ---------- ১৪৮

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৮ হিজরী) ---------- ১৪৮

হুমাইদ ইবন সাওর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (মৃত ৬১ হিজরীর পরে) ---------- ১৪৯

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (৬৮ হিজরী) ---------- ১৫০

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৭৪ হিজরী) ---------- ১৫৪

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (৭৪ হিজরী) ---------- ১৫৫

আবু জুরাই জাবের ইবন সুলাইম আল-হুজাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ---------- ১৫৫

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাবে'য়ীদের বক্তব্য** ---------- ১৫৬

কা'ব আল-আহবার (৩২ হিজরী) ---------- ১৫৬

মাসরূক ইবনুল আজদা' (৬৩ হিজরী) ---------- ১৫৭

মুজাহিদ ইবন জাবর রাহিমাহুল্লাহ (১০৪ হিজরী) ---------- ১৫৭

আবুল 'আলীয়া (৯৩ বা ১০৬ হিজরী) ---------- ১৫৮

আদ-দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম (১০০ মতান্তরে ১০৩ বা ১০৬) ---------- ১৫৮
আবু ক্বিলাবাহ আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ আল-জারমী (১০৪ হিজরী) ---------- ১৫৯
শুরাইহ ইবন 'উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ (১০৮ হিজরী) ---------- ১৫৯
আবু ঈসা ইয়াহইয়া ইবন রাফে' আস-সাক্বাফী (১১০ এর পূর্বে) ---------- ১৬০
হাসান বসরী (১১০ হিজরী) ---------- ১৬০
ক্বাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৭ হিজরী) ---------- ১৬১
সাবেত আল-বুনানী (১২৭ হিজরী) ---------- ১৬২
মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ (১২৭ হিজরী) ---------- ১৬২
মাইসারাহ ইবন হাবীব আন-নাহদী, আবু হাযেম (১৩০ হিজরী) ---------- ১৬২
আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী (১৩১ হিজরী) ---------- ১৬৩
রবী'আহ ইবন আবদুর রাহমান আর রায় (১৩৬ হিজরী) ---------- ১৬৩
রবী' ইবন আনাস (১৩৯ হিজরী) ---------- ১৬৪
সুলাইমান ইবন ত্বারখান আত-তাইমী (১৪৩ হিজরী) ---------- ১৬৪
**তৃতীয় পরিচ্ছেদ: তাবে' তাবে'য়ীগণের বক্তব্য** ---------- ১৬৫
মুকাতিল ইবন হাইয়ান (১৪৯/১৫০ হিজরী) ---------- ১৬৫
ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হিজরী) ---------- ১৬৫
ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ (১৫৭ হিজরী) ---------- ১৬৭
ইমাম সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী (১৬১ হিজরী) ---------- ১৬৮
সাল্লাম ইবন আবু মুতী' আল-খুযা'ঈ (১৬৪ হিজরী) ---------- ১৬৮
আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী সালামাহ ইবনুল মাজেশূন (১৬৪ হিজরী) ---------- ১৬৯
হাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন দীনার (১৬৭ হিজরী) ---------- ১৭১
খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী (১৭০ হিজরী) ---------- ১৭১
ইমাম লাইস ইবন সা'দ আল-মিসরী (১৫৭ হিজরী) ---------- ১৭২
ইমাম মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হিজরী) ---------- ১৭৩
ইমাম হাম্মাদ ইবন যায়েদ আল-বসরী (১৭৯ হিজরী) ---------- ১৭৪
শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হিজরী) ---------- ১৭৪
ইমাম আবু ইউসুফ ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম, আবু হানীফার ছাত্র (১৮২ হিজরী ---------- ১৭৬
'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম ইবন 'উমার আল-কিলাবী (১৮৫ হিজরী) ---------- ১৭৬
ইমাম ফুদ্বাইল ইবন ইয়াদ্ব (১৮৭ হিজরী) ---------- ১৭৭
জরীর ইবন আবদুল হামীদ আদ-দ্বিব্বী (১৮৮ হিজরী) ---------- ১৭৭
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হিজরী) ---------- ১৭৭
শুজা' ইবন আবু নসর আল-বালখী (১৯০ হিজরী) ---------- ১৭৮
আবু বকর ইবনু 'আইয়াশ (১৯৩ হিজরী) ---------- ১৭৮
ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ (১৯৬ হিজরী) ---------- ১৭৯
ইমাম আবদুর রাহমান ইবন মাহদী (১৯৮ হিজরী) ---------- ১৮০
আবু মু'আয খালিদ ইবন সুলাইমান আল-বালখী আল-হানাফী (১৯৯ হিজরী) ---------- ১৮১

মানসূর ইবন আম্মার ইবন কাসীর, আবুস সারী আস-সুলামী আল-খুরাসানী (২০০ হিজরী) ---- ১৮১
আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফর আর-রাযী (২০০ হিজরীর পরে) ---------- ১৮১
হিশাম ইবন আব্দুল্লাহ আর-রাযী আল-হানাফী (২০০ হিজরীর পর) ---------- ১৮২
ইমাম নদ্বর ইবন শুমাইল (২০৩ হিজরী) ---------- ১৮২
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী (২০৪ হিজরী) ---------- ১৮৩
ওয়াহাব ইবন জারীর (২০৬ হিজরী) ---------- ১৮৫
ইয়াযিদ ইবন হারূন আল-ওয়াসিতী (২০৬ হিজরী) ---------- ১৮৬
বিশর ইবন 'উমার (২০৭ হিজরী) ---------- ১৮৬
ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ আল-ফাররা (২০৭ হিজরী) ---------- ১৮৭
সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ্ব-দ্ববা'ঈ (২০৮ হিজরী) ---------- ১৮৭
আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না (২০৯ হিজরী) ---------- ১৮৮
আল-হাসান ইবন মূসা আল-আশইয়াব (২১০ হিজরী) ---------- ১৮৮
মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন ওয়াক্কেদ ইবন উসমান আদ-দ্বিব্বী (২১২ হিজরী)---------- ১৮৯
আবদুল মালিক ইবন ক্বারীব আল-আসমা'ঈ (২১৩ হিজরী) ---------- ১৮৯
আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার 'ঈসা ইবন মাহান আর-রাযী (২১৮ হিজরীর পূর্বে) ---------- ১৯০
আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হিজরী) ---------- ১৯০
আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
ইমাম বুখারীর উস্তাদ 'আসেম ইবন আলী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী (২২১ হিজরী) ---------- ১৯১
আবু 'উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম আল-হারাওয়ী (২২৪ হিজরী) ---------- ১৯২
সুনাইদ ইবন দাউদ (২২৬ হিজরী) ---------- ১৯২
বিশর ইবন হারেস আল-হাফী (২২৭ হিজরী) ---------- ১৯৩
মুহাম্মাদ ইবন মুস'আব আল-'আবেদ (২২৮ হিজরী) ---------- ১৯৩
নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ (২২৯ হিজরী) ---------- ১৯৩
মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হান্নাদ আল-বূশাঞ্জী (২৩০ হিজরী) ---------- ১৯৪
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ ইবনুল আ'রাবী (২৩১ হিজরী) ---------- ১৯৪
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (২৩৩ হিজরী) ---------- ১৯৫
ইমাম আবু মা'মার ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মা'মার আল-ক্বাতী'ঈ (২৩৬ হিজরী) ------ ১৯৬
ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ আল-মারওয়াযী (২৩৮ হিজরী) ---------- ১৯৬
আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া আল-কিনানী (২৪০ হিজরী) ---------- ১৯৮
ইমাম ক্বুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ আল-বাগলানী (২৪০ হিজরী) ---------- ১৯৯
ইমাম আবদুস সালাম ইবন সা'ঈদ ইবন হাবীব 'সাহনূন' আল-ক্বাইরোয়ানী (২৪০ হিজরী)----- ২০০
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (২৪১ হিজরী)---------- ২০০
ইমামে রাব্বানী মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-ত্বূসী (২৪২ হিজরী) ---------- ২০৩
প্রখ্যাত ওয়া'য়েয হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী (২৪৩ হিজরী) ---------- ২০৩
যুন্নূন আল-মিসরী (২৪৫ হিজরী) ---------- ২০৭
ইবন কুল্লাব (২৪৫ হিজরী) ---------- ২০৭

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তাবে' তাবে'য়ীন পরবর্তী ইমামগণের অভিমত** ---------- ২১২
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবদুল হাকাম আল-ওয়াররাক (২৫১ হিজরী) ----- ২১২
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু আসেম খাশাইশ ইবন আসরাম (২৫৩ হিজরী) ---------- ২১২
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (২৫৬ হিজরী) ---------- ২১৩
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী (২৫৮ হিজরী) ---------- ২১৫
ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-ক্বুশাইরী (২৬১ হিজরী) ---------- ২১৫
ইমাম যুহলী (২৬৪ হিজরী) ---------- ২১৬
ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী (২৬৪ হিজরী) ---------- ২১৭
আবু হাতিম আর-রাযী (২৭৭ হিজরী) ও আবু যুর'আ আর-রাযী (২৬৪ হিজরী) ---------- ২১৮
ইমাম ইবন মাজাহ (২৭৩ হিজরী) ---------- ২২০
ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী (২৭৫ হিজরী) ---------- ২২১
আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহ (২৭৬ হিজরী) ---------- ২২১
আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯ হিজরী) ---------- ২২৩
'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী (২৮০ হিজরী) ---------- ২২৫
হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী (২৮০ হিজরী) ---------- ২২৯
ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-হারবী (২৮৫ হিজরী) ---------- ২৩০
ইবন আবি 'আসিম আন-নাবীল (২৮৭ হিজরী) ---------- ২৩০
আবুল 'আব্বাস সা'লাব (২৯১ হিজরী) ---------- ২৩১
মুহাম্মাদ ইবন 'উসমান ইবন আবী শাইবাহ (২৯৭ হিজরী) ---------- ২৩১
ইমাম 'আরিফ আবু 'আবদুল্লাহ 'আমর ইবন 'উসমান আল-মাক্কী (২৯৭ হিজরী) ---------- ২৩২
ইমাম আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী (৩০৩ হিজরী) ---------- ২৩৩
আহমাদ ইবন 'উমার ইবন সুরাইজ (৩০৬ হিজরী) ---------- ২৩৬
যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী (৩০৭ হিজরী) ---------- ২৩৭
মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারী (৩১০ হিজরী) ---------- ২৩৮
ইমাম আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনুস সারী আয-যাজ্জাজ (৩১১ হিজরী) ---------- ২৩৯
হাফেয ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন ইবনুল আখরাম (৩১১ হিজরী) ---------- ২৩৯
ইমামুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক্ব ইবন খুযাইমাহ (৩১২ হিজরী) ---------- ২৪০
ইমাম আবু 'আওয়ানাহ ইয়া'কূব ইবন ইসহাক্ব আল-ইসফারায়ীনী (৩১৬ হিজরী) ---------- ২৪১
ইমাম আবু বকর ইবন আবী দাউদ আস-সিজিস্তানী (৩১৬ হিজরী) ---------- ২৪২
আবু আবদুল্লাহ আয-যুবাইর ইবন আহমাদ আয-যুবাইরী আশ-শাফে'য়ী (৩১৮ হিজরী) ---- ২৪৩
আবু জা'ফর আহমাদ ইবন সালামাহ আত-তাহাবী (৩২১ হিজরী) ---------- ২৪৩
ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফাহ নিফত্বাওয়াইহ (৩২৩ হিজরী) ---------- ২৪৪
আবুল হাসান আল-আশ'আরী (৩২৪ হিজরী) ---------- ২৪৫
**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী পরবর্তী ইমামগণের মত** --------- ২৪৯
আবু জা'ফার আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আন-নাহহাস (৩২৮ হিজরী) ------- ২৪৯
আল-ইমাম আল-হাসান ইবন আলী আল-বারবাহারী (৩২৯ হিজরী) ---------- ২৪৯
ইমাম, মুহাদ্দিস, ওযীর আলী ইবন 'ঈসা (৩৩৪ হিজরী) ---------- ২৫০

আবু বকর আদ্ব-দ্বিব'য়ী (৩৪২ হিজরী) ---------- ২৫০
ইবন শা'বান আল-মালেকী (৩৫৫ হিজরী) ---------- ২৫১
আবু আহমাদ আল-'আসসাল (৩৪৯ হিজরী) ---------- ২৫১
আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী (৩৬০ হিজরী) ---------- ২৫২
আল-ইমাম আল-হাফিয আবুল কাসিম আত-ত্বাবারানী (৩৬০ হিজরী) ---------- ২৫৩
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুজাহিদ আত-ত্বায়ী আল-বসরী (৩৬০ এর পরে)-------- ২৫৪
হাফিয আবুশ শাইখ আসবাহানী, (৩৬৯ হিজরী) ---------- ২৫৪
ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল আযহার আল-আযহারী (৩৭০ হিজরী) --- ২৫৫
ইমাম আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী আশ-শাফে'য়ী (৩৭১ হিজরী) ---------- ২৫৫
আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর ছাত্র) (৩৮০ হিজরী প্রায়) ---------- ২৫৬
ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাক্বুত্বনী (৩৮৫ হিজরী) ---------- ২৫৯
ইমাম ইবন আবী যাইদ আল-কাইরাওয়ানী (৩৮৬ হিজরী) ---------- ২৬০
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ আল-'উকবারী (৩৮৭ হিজরী) ---------- ২৬২
আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (৩৮৮ হিজরী) ---------- ২৬৫
ইমাম আহমাদ ইবন ফারেস ইবন যাকারিয়া আর-রাযী (৩৯৫ হিজরী) ---------- ২৬৬
ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মানদাহ (৩৯৫ হিজরী) ---------- ২৬৬
ইমাম আবুল কাসেম খালাফ আল-মুক্বরী আল-আন্দালুসী (৩৯৩ হিজরী) ---------- ২৬৯
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা ইবন আবী যামানিইন (৩৯৯ হিজরী) ---- ২৭১
আবু বকর আল-বাকিল্লানী (৪০৩ হিজরী) ---------- ২৭১
ইবন মাওহাব আল-মাকবুরী আল-মালেকী (৪০৬ হিজরী) ---------- ২৭৫
মা'মার ইবন আহমাদ ইবন যিয়াদ আল-আসবাহানী (৪১৮ হিজরী) ---------- ২৭৬
ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ লালেকাঈ (৪১৮ হিজরী) ---------- ২৭৭
সুলতানুল মুসলেমীন মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন (৪২১ হিজরী) ---------- ২৭৮
খলীফাতুল মুসলিমীন ক্বাদের বিল্লাহ, আল-ইমাম আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনুল আমীর ইসহাক্ব ইবনুল খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মুক্বতাদির ইবনুল মু'তাদ্বিদ ইবন ত্বালহা ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মু'তাসিম ইবনু হারূন ইবন আবু জা'ফর আল-মানসূর আল-হাশেমী আল-আব্বাসী আল-বাগদাদী (৪২২ হিজরী) ----- ২৭৯
ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী (৪২২ হিজরী) ---------- ২৭৯
ইমাম কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী (৪২২ হিজরী) ---------- ২৮১
ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী আল-মালেকী (৪২৯ হিজরী) ---------- ২৮১
আবু নু'আইম আল-আসবাহানী (৪৩০ হিজরী ---------- ২৮২
আবুল হাসান আলী ইবন 'উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-কাযওয়ীনী (৪৪২ হিজরী) --- ২৮৩
আবু নাসর 'উবাইদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ আস-সিজযী (৪৪৪ হিজরী) ---------- ২৮৪
ইমাম আবু 'আমর উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন উসমান ইবন উমার আদ-দানী (৪৪৪ হিজরী) --- ২৮৭
আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইউব আর-রাযী (৪৪৭ হিজরী)---------- ২৯১
হাফিয আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাক্বী (৪৫৮ হিজরী) ---------- ২৯২

ইমাম আবু 'আমর 'উসমান আস-সাহরাযূরী আল-ফকীহ (বাইহাকীর সাথী) ---------- ২৯৬
ইমাম আবু 'উমার ইবন আবদুল বার (৪৬৩ হিজরী) ---------- ২৯৭
আবু বকর আল-খাতীব, খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩ হিজরী)---------- ২৯৯
সা'দ ইবন আলী আয-যাঞ্জানী (৪৭১ হিজরী) ---------- ৩০০
ইমাম ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন সাওরাহ আন-নাইসাপূরী (৪৭৭ হিজরী) --- ৩০১
ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হিজরী) ---------- ৩০১
ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী (৪৮১ হিজরী) ---------- ৩০৩
ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাদ্বরামী আল-ক্বাইরোয়ানী (৪৮৯ হিজরী) -- ৩০৩
ইমাম আবুল মুযাফফার মানসূর আস-সাম'আনী (৪৮৯ হিজরী)---------- ৩০৪
ইমাম আবুল ফাতহ নাসর ইবন ইবরাহীম আল-মাক্বদেসী, আশ শাফে'য়ী (৪৯০ হিজরী)---- ৩০৬
ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী (৫১০ হিজরী) ---------- ৩০৬
ইমাম আবু আহমাদ উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবনুল-হাদ্দাদ (মৃত্যু ৫১৭)--- ৩১০
আবুল হাসান ইবন আয-যাগূনী (৫২৭ হিজরী) ---------- ৩১১
ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী (৫৩২ হিজরী) ---------- ৩১১
ইমাম আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তাইমী (৫৩৫ হিজরী) ---------- ৩১২
ইমাম আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী আল-হাক্কারী (৫৫৫ হিজরী) ---------- ৩১৪
আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল-'ইমরানী (৫৫৮ হিজরী) ---------- ৩১৪
ইমাম আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হিজরী) ---------- ৩১৮
ইমাম ইবন রুশদ আল-মালেকী (৫৯৫ হিজরী) ---------- ৩২০
ইমাম আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাক্বদেসী (৬০০ হিজরী) ---------- ৩২১
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল-কুরতুবী (৬৭১ হিজরী) ------ ৩২২
শাইখ শিহাবউদ্দীন আবু হাফস 'উমার আস-সাহরাওয়ার্দী (৬৩২ হিজরী) ---------- ৩২৩
শাইখ তাক্বীউদ্দীন আল-মাক্বদেসী (৬৮০ হিজরী বা তার পূর্বে) ---------- ৩২৩
ইবন শাইখুল হুযামীন (৭১১ হিজরী) ---------- ৩২৫
**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও তার পরবর্তী ইমামগণের অভিমত** ---------- ৩২৯
ইবন তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হিজরী) ---------- ৩২৯
ইমাম ইবন আবদুল হাদী আল-মাক্বদেসী (৭৪৪ হিজরী) ---------- ৩৩৮
ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী)---------- ৩৩৯
ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী) ---------- ৩৪২
ইবন কাসীর (৭৭৪ হিজরী) ---------- ৩৫২
ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী (৭৯২ হিজরী) ---------- ৩৫৩
ইবন রাজাব (৭৯৫ হিজরী) ---------- ৩৫৮
জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবন আবদুল হাদী ইবনুল মাবরিদ (৯০৯ হিজরী) ---------- ৩৬৪
ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী, আস-সিন্দী (১১৩৮ হিজরী) ------ ৩৬৬
আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১৬৪ হিজরী) ---------- ৩৬৮
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বিলগ্রামী (১১৭৩ হিজরী) ---------- ৩৭০

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস আদ-দেহলাওয়ী (১১৭৬ হিজরী) ---------- ৩৭১
শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (১২০৬ হিজরী) ---------- ৩৮২
শাইখ সালামুল্লাহ ইবন ফাখরুদ্দীন আদ-দেহলাওয়ী (১২৩৩ হিজরী) ---------- ৩৯১
শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী (১২৪৬ হিজরী) ---- ৩৯২
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (১২৫০ হিজরী) ---------- ৩৯৭
আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী (১২৮৩ হিজরী) ---------- ৪০০
ইমাম আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনাওয়ী (১৩০৪ হিজরী) ---------- ৪০০
আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী আল-কিন্নাওজী (১৩০৭ হিজরী) ---------- ৪০৫
আল্লামা মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী (১৩২০ হিজরী) ---------- ৪০৮
আব্দুল জাব্বার আল-গাযনাওয়ী (১৩৩১ হিজরী) ---------- ৪০৯
আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী (১৩৩২ হিজরী) ---------- ৪১৫
শাইখ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ ইবন মু'আযযাম শাহ আল-কাশমীরী (১৩৫৩ হিজরী) ---------- ৪১৭
আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী (১৩৭৬ হিজরী) ---------- ৪২৩
শাইখ আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লেমী (১৩৮৬ হিজরী) ---------- ৪২৭
শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীত্বী (১৩৯৩ হিজরী)---------- ৪২৮
শাইখ ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ইবন হাফিয মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ কাসেম
নানুতুওয়ী (১৪০৩ হিজরী) ----------৪৩৩
শাইখ সাইয়্যেদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৫ হিজরী) ----------৪৩৫
শাইখ সাইয়্যেদ বাদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৬ হিজরী) ---------- ৪৩৫
শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৩৫
শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরউদ্দীন আল-আলবানী (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৪১
শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায (১৪২০ হিজরী) ---------- ৪৫৫
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (১৪২১ হিজরী) ---------- ৪৬০

**সপ্তম অধ্যায়:**

**আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও সাথে থাকা** ---------- ৪৬৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' তাঁর একটি মহৎ গুণ ---------- ৪৬৯
কুরআনে কারীম থেকে দলীল ---------- ৪৬৯
আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' গুণটির ব্যাপারে হাদীস থেকে দলীল ---------- ৪৭০
ইজমা'র দলীল ---------- ৪৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ ---------- ৪৭১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা'র ব্যাপারে
সালাফদের ব্যাখ্যা ----------৪৭৩
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'বান্দার সাথে থাকা' প্রকৃত অর্থেই সাথে থাকা ---------- ৪৭৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক একই সময়ে বান্দার সাথে থাকা ও
'আরশের উপর থাকা সাংঘর্ষিক নয় ---------- ৪৮৩

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন ---------- ৪৯৬

**অষ্টম অধ্যায়:**
**'আরশের উপর থাকা ও নিকটে থাকা** ---------- ৪৯৮
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা একটি মহৎ গুণ ---------- ৪৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার নিকটে থাকার গুণ সাব্যস্ত করার নীতি ---- ৫০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন ---------- ৫০১

**নবম অধ্যায়:**
**আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও নিকটতম আসমানে অবতরণ করা** ---------- ৫০৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর একটি মহৎ গুণ -- ৫০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ-বিশ্বাস ---------- ৫০৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর 'আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয় ---------- ৫০৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে অবতরণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর ---------- ৫১২

**দশম অধ্যায়:**
**'ইস্তেওয়া আলাল আরশ' এর অর্থে ভিন্ন মতাবলম্বী ও তাদের যুক্তির সংক্ষিপ্তাকারে খণ্ডন** ---------- ৫১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: তাবে তাবে'য়ী ও তাদের পরবর্তী কিছু কিছু আলেম থেকে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ব্যাপারে ভিন্নমত বর্ণিত হওয়া ও তার কারণ ---------- ৫১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তা'ওয়ীল ও তাফওয়ীদ্ব নীতির খণ্ডন ---------- ৫২৬

**শেষকথা** ---------- ৫৪৯

# প্রকাশকের কথা

সর্বান্তকরণ প্রশংসা ঘোষণা করছি সেই মহান সত্তার যিনি দীন ইসলামের দৌলত দিয়ে আমাদের সামনে চিরস্থায়ী মুক্তির পথ উন্মোচন করেছেন। যিনি তাঁর 'আরশকে সপ্তম আসমানের উপরে উঠিয়ে তাতে আরোহন করেছেন, আর তাঁর সৎ বান্দাদেরকে সেটি বিশ্বাস করার জন্য তাওফীক দিয়েছেন। সর্বোত দুরূদ ও শান্তি কামনা করছি নির্বাচিত রাসূল সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যাকে মহান রব 'আরশের উপরে থেকে ডেকে নিয়ে ওহীর নি'আমতে ধন্য করেছেন।

আমরা জানি ইসলামী জীবনদর্শনে বিশুদ্ধ আকীদাহ'র গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিহার্য। মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনের ইবাদাত সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ইত্যাদি যাই করা হয়; সবকিছু কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আকীদাহ একান্ত আবশ্যক। আর বিশুদ্ধ আকীদাহ বলতে তাওহীদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কেই বুঝায়।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মাক্কী জীবনে সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একাধারে দশটি বছর শুধুমাত্র তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। পরবর্তীতে মাদানী জীবনেও তাওহীদের প্রচার-প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

তাওহীদ মানেই হচ্ছে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। তন্মধ্যে প্রথমেই আসে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জানা। 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ আকীদাহটি এ তিনটি অংশের সাথেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই আকীদাহ'র বাকী বিষয়গুলো জানা সহজ হয়, নতুবা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো অবস্থা হয়।

প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এতে বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার, দেশবরেণ্য আলেম, সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ আকীদাহটি হাজারো গ্রন্থ থেকে মুক্তোতুল্য তথ্যাবলি দিয়ে অলংকৃত করে সাধারণ পাঠকদের জন্য বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যের ভাষায় বলতে গেলে-

"এ যেনো শব্দের পরতে পরতে তথ্যের সমাহার
যা পাঠে কেটে যাবে অজানায় হাতড়ে বেড়ানো আধার"

আমরা গ্রন্থটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি গ্রন্থকার থেকে শুরু করে এটি মুদ্রণযোগ্য হয়ে আসার কর্মপরম্পরায় যারা সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন সকলের জন্য 'আরশে আযীম এর মালিকের কাছে সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে একটিই প্রার্থনা, হে 'আরশের অধিপতি! আপনি এই গ্রন্থটিকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন।

প্রকাশক

# ভূমিকা

আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তাঁর ‘আরশকে সপ্তম আসমানের উপরে উঠিয়েছেন, তাঁর সৎ বান্দাদের অন্তরকে সেটা বিশ্বাস করার জন্য উপযোগী করে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি তাঁর ‘আরশের উপরে উঠেছেন এবং সেখানেই আছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, ‘আরশের উপর থেকে তিনি তাঁর নবীকে ডেকে নিয়েছেন এবং তাঁর কাছে সেখান থেকে ওহী প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে যেসব বড় বড় নি‘আমত প্রদান করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিনি আমাদের জন্য তাঁর দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, আকীদাহকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং শরী‘আতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীনের মধ্যে যা কিছুর প্রয়োজন আমাদের হবে, সেসবই তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের যবানীতে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে আকীদাহ বিষয়ক জ্ঞান। আর আকীদাহ বিষয়ক জ্ঞান বলতে সে জ্ঞানকে বুঝায় যা আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সংক্রান্ত জ্ঞানই হচ্ছে তাওহীদের জ্ঞান। তাওহীদ মানেই হচ্ছে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। তন্মধ্যে প্রথমেই আসে আল্লাহ তা‘আলার সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জানা। ‘আল্লাহর ‘আরশের উপর উঠা’ এ আকীদাহটি এ তিনটি অংশের সাথেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই আকীদাহ’র বাকী বিষয়গুলো জানা সহজ হয়, নতুবা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো অবস্থা হয়। এখানে কয়েকটি নিরেট সত্য কথা আমাদের জানা থাকতে হবে:

১- সহীহ আকীদাহ’র বিষয়টি কুরআন ও সুন্নায় বিস্তারিত এসেছে। আকীদাহ’র কোনো বিষয়, বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলার সত্তা, নাম ও গুণ এমন নয় যা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়নি।

২- সহীহ আকীদাহ’র বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদেরকে সাধারণ ফিকহী জিনিস বিস্তারিত বলেছেন, আর আকীদাহ’র মৌলিক আল্লাহ তা‘আলার নাম ও গুণের বিষয়ে বলেননি, এমনটি হতে পারে না। বরং তিনি আকীদাহ’র বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন। একটি উদাহরণ দিতে পারি, কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও তাওহীদের মাপকাঠি হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা উপরের দিকে থাকাকে নির্ধারণ করেছেন। যেখানে দাসীর ঈমান পরীক্ষা করেছেন আসমানের উপরে ‘আরশে থাকার বিষয়টি তার কাছ থাকার মাধ্যমে। ইমাম যাহাবী বলেন, ‘দাসীকে মুক্ত করার হাদীস থেকে দু’টি জিনিস জানা যায়: এক. মুসলিমের জন্য এটা প্রশ্ন করা শরী‘আতসম্মত যে, আল্লাহ কোথায়? দুই. যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তার জন্য উত্তর দেয়া বৈধ যে, আসমানের উপরে।’[1]

৩- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম আকীদাহ’র বিষয়গুলো বিস্তারিত বুঝতেন। তারা

১. যাহাবী, আল-‘উলূ, পৃ. ২৮।

আল্লাহর নাম ও গুণকে ভালোভাবেই জানতেন। সেজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়েছেন, সিফাতকে ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম ও জান্নাতে যাওয়ার কারণ। হাদীসে এসেছে, 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে কোনো এক অভিযানের জন্য আমীর করে পাঠালেন, তিনি সালাতে তার সাথীগণকে নিয়ে কুরআন পড়তেন। কিন্তু তিনি কিরাআতের সমাপ্তি টানতেন সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে। অতঃপর তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসলেন তখন সাহাবীগণ সেটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে উক্ত কাজটি করত? তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কারণ এটি রহমানের গুণ। আর আমি এটা দিয়ে সালাত পড়তে পছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।"[2]

অপর হাদীসে এসেছে, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আনসারগণের এক লোক তাদের নিয়ে মসজিদে কুবাতে ইমামতি করতেন। তিনি যখনই কোনো সূরা দিয়ে সালাত শুরু করতেন, যা দিয়ে সালাত পড়া হয়, তখনই তিনি প্রথমেই 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা দিয়ে শুরু করতেন তারপর তা শেষ করতেন, তারপর এর সাথে অন্য আরেকটি সূরা পড়তেন। আর তিনি সেটা প্রতি রাকাতেই করতেন। তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বললে তারা বলল, তুমি এ সূরা (ইখলাস) দিয়ে শুরু কর, তারপর এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে মনে কর না যতক্ষণ না তুমি তার সাথে অন্য সূরা মিলাচ্ছ, হয় তুমি এটা দিয়েই সালাত পড় নতুবা এটাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কোনো সূরা দিয়ে সালাত পড়। তখন সে বলল, আমি সেটা ছাড়তে পারবো না, যদি তোমরা পছন্দ করো যে, আমি এভাবে তোমাদের সালাতের ইমামতি করব, তাহলে তা করবো, নতুবা আমি তোমাদের ছেড়ে যাব। আর তারা মনে করত সে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, আর সে ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করবে সেটা তারা অপছন্দ করত। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, "হে অমুক, তোমার সাথীরা তোমাকে যা করতে বলে তা করতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল, আর কিসে তোমাকে প্রতি রাকাতে এ সূরা পড়তে বাধ্য করলো?" সে বলল, আমি এ সূরাটিকে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।"[3]

৪- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম আকীদাহ'র মিশন নিয়েই দাওয়াতে বের হয়েছিলেন, তারা নিছক ফিকহী মাসআলা নিয়ে বের হননি। তারা যদি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জানতেন তবে দাওয়াত কিসের দিকে দিলেন? তারা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সবকিছুর আগে আকীদাহ'র দাওয়াত দিয়েছেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময়ে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা এর ওপর প্রমাণবহ।

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১৩।

৩. সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ, দু' সূরা একত্রে পড়া (১/১৫৪); তিরমিযী, হাদীস নং ২৯০১।

৫- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম দর্শনতত্ত্ব জানতেন না, কিন্তু তারা তাওহীদ জানতেন, আকীদাহ জানতেন। আল্লাহর জন্য কী সাব্যস্ত করা যাবে আর কী সাব্যস্ত করা যাবে না তা তারা ভালো করেই জানতেন, আর তারা তা বলেও গেছেন। তারা কেউই কঠিন দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন না। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাদের যাবতীয় আকীদাহ গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ থেকে হিদায়াত নেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হতো না, হলেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, তারপর তাদের মধ্যকার বিজ্ঞজন থেকে জেনে নিতেন। সে বিজ্ঞজনেরা জগতের সকল মুসলিমের মাথার উপর শিক্ষক হিসেবে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যতক্ষণ ফিতনা প্রকাশিত না হতো ততক্ষণ সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে আলোচনা করতেন না। বিস্তারিত আলোচনা না করার অর্থ, কখনো না জানা নয়। তাদের কাছে এগুলো এতই স্পষ্ট ছিল যেমন দিন স্পষ্ট থাকে রাত থেকে। কিন্তু যখনই বিভ্রান্তি দেখা গেছে তখনই তারা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম আকীদাগত ফিতনা ছিল তাকদীর সম্পর্কে, সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে আলোচনা করতে সামান্যও কমতি করেননি।[4] এখন কেই যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীরের মাসআলা বলে যাননি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তাকদীর বুঝতেন না, তাহলে তারা অবশ্যই উম্মতের সর্বাত্তম ব্যক্তিদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করলেন। বস্তুত তারা আকীদাহ যথাযথভাবে বুঝেছেন, সবাই আকীদাতে একমত ছিলেন, অতঃপর যখনই আকীদায় ভিন্ন কিছু প্রকাশ পেয়েছে তখনই তারা সেটার বিরুদ্ধে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

তেমনিভাবে তাবে'য়ীগণের যুগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে আকীদাহ তার সঠিক পথেই চলছিল। ইতোমধ্যে জা'দ ইবন দিরহাম ও তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে[5], তখনই উম্মতের কাণ্ডারী তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। তাদের বিরুদ্ধে উম্মতের সচেতন সবাই তখন কঠোরভাবে পর্বতসম বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তারা যেসব ভুল আকীদাহ প্রচার-প্রসারে লিপ্ত ছিল তারা সেগুলোর রদ করতে থাকেন।

৬- বস্তুত তাবে'য়ীগণ সাহাবীগণের পদাঙ্কে চলে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আকীদাহ বিষয়ে তারা তাদের বক্তব্য বলে গেছেন। তারা বারবার জাহমী আকীদাহ ও তাদের পরবর্তী মু'তাযিলাদের আকীদাহ'র বিরোধিতায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, উম্মতকে সাবধান করে গেছেন। তারপরও দেখা যায় জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অনুসারীরা ভিন্ন মত ও পথে উম্মতের বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাসে সমস্যা তৈরি করে। তারা কুরআন ও হাদীসের জায়গায় কখনও বিবেকের যুক্তিকে আবার কখনও কখনও তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের নতুন মোড়কে মুসলিমদের মাঝে উপস্থাপন করে। তখন উম্মতের আলেমগণ সহীহ আকীদাহ'র ধারক-বাহকগণ গ্রন্থ রচনা করে লোকদেরকে তা থেকে সাবধান করে।

---

৪. ইমাম আওযা'ঈ তা বলেছেন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ১৩৯৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪১৪)।

৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০)।

৭- এরপর আসে তাবে তাবে'য়ীগণ, তাদের সময় বাতিলের জয়-জয়কার শুরু হয়ে যায়। তখন ছিল হিদায়াতের ইমামগণের যুগ। ফিকহের ইমাম প্রত্যেকেই তাদের ভূমিকা সেখানে রাখেন। তবে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখেন হাদীসের ইমামগণ। তারা এ বিষয়ে এতোই সাবধান থাকেন যে, আকীদাহ-বিশ্বাসে ত্রুটি আছে এমন কারও কাছ থেকে তারা হাদীস গ্রহণ করতেন না। তারা তখন হাদীসের গ্রন্থে বা তার বাইরে, সুন্নাহ, তাওহীদ, আকীদাহ, ঈমান ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সহীহ আকীদাহ তুলে ধরেন। এখন কেউ যদি বলে যে, সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ এসব আকীদাহ জানতেন না তাহলে অবশ্যই তিনি উম্মতের প্রথম সারির জ্ঞানীদের মূর্খ মনে করছেন। এর জন্য তিনি নিজেই দায়ী, সোনালী মানুষগুলোর চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন সামান্যও কম হবে না।

৮- পরবর্তীকালের আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির সর্বদা মানুষদেরকে সহীহ আকীদাহ'র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তারা সালাফে সালেহীনের আকীদাহ তুলে ধরার পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদাহ'র উৎস সম্পর্কেও সাবধান করেছেন। কিন্তু এ সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় উম্মতের মধ্যে কালামশাস্ত্র নামে একটি বিভ্রান্ত মানহাযের ব্যাপক বিস্তৃতি। যারা জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাদের রেখে যাওয়া আকীদাহ-বিশ্বাসের নীতির ওপর তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করে। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'র কথা বাদ দিয়ে বিবেকের যুক্তিকে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের ভার প্রদান করে, ফলে তারা আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্মের ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা তৈরি করে রেখে যায়। তারাই পরবর্তীতে আশ'আরী ও মাতুরিদী মতবাদের অনুসারীর নামে খ্যাত হয়।

৯- হিদায়াতের ইমামগণ সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করে এসব ভ্রান্ত আকীদাহ'র বিরুদ্ধে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের 'আসার' নিয়ে সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মানুষদেরকে সাবধান করে। যেমন, ইমাম দিমইয়াত্বী (মৃত্যু ৭০৫ হিজরী) বলেন, বর্তমান সময়ের অনেকেই মানকূল বা কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলম অর্জন বাদ দিয়ে মা'কূল বা দর্শনবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যস্ত রয়েছে। তাই তারা ইলমুল মানতিক পড়ে চলেছে। তারা বিশ্বাস করছে, যে কেউ এ বিদ্যা রপ্ত করবে না সে কথাই বলতে জানে না। হায়, আমার বুঝে আসে না যে, তারা এটা কীভাবে বলতে পারে! ইমাম শাফে'য়ী ও মালিক রাহিমাহুমাল্লাহ কি তা শিখেছিলেন? নাকি এটি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র পথ আলোকিত করেছিল? এটা কি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ শিখেছিলেন? নাকি ইমাম সাওরী রাহিমাহুল্লাহ সেটা শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঝুঁকেছিলেন? তারা তো কেউই এ পথে চলেননি। তুমি কি মনে করছ যে, তাদের তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় সমস্যা ছিল? তারা তো সেটা অর্জন করার জন্য সময় ব্যয় করেননি। কখনও নয়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এসবই তথাকথিত মানতিক নামক বিদ্যার জেলখানায় আটকে থাকার থেকে অনেক সম্মানিত, সেগুলো বরং আরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ যে, সেগুলোকে তথাকথিত মানতিক বিদ্যার অপছায়ায় ফেলে রাখতে হবে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ জাতি এমন জিনিসে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছে যা তাদের কোনো উপকার করবে না, তারা এমন বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছে যা তাদেরকে কখনো অমুখাপেক্ষী করবে না। বরং তাদেরকে বিষধর বিপদে ফেলবে ও সমস্যায় নিপতিত করবে। আর শয়তান তাদেরকে ওয়াদা করছে ও তাদেরকে দূরাশায় নিক্ষেপ

করছে। এ বিদ্যার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, একক কোনো আলেম সেটার দিকে তাকিয়ে দেখবে, কোনো পরিশ্রম ব্যয় না করে কেবল পড়ে দেখবে, সেটার প্রতি কোনো রকম সাহায্যকারী না হয়ে; কারণ এ ইলমের যে ক্ষতি রয়েছে তার সবচেয়ে কমটিই হচ্ছে এই যে, তা মানুষকে অর্থহীন কাজে ব্যস্ত রাখে এমন জিনিসের মুখাপেক্ষী করে দেয় যা থেকে করুণাময় রাব্বুল আলামীন তাকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। অথচ এ লোকগুলো এ বিদ্যাকে করে নিয়েছে স্থায়ী ও প্রশ্নাতীতভাবে মানার বিষয়ের একমাত্র হাতিয়ার। তারা এর মধ্যে প্রচুর ধৌড়-ঝাপ করে, এটা অর্জনের জন্য জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করে। মনে হচ্ছে যেন তারা হিদায়াতের প্রতি আহ্বানকারী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা শুনেনি, যখন কোনো একজন এ ধরনের বিদ্যার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যখন তিনি দেখলেন যে, 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে তাওরাতের কিছু অংশ ফলকে লিখে নিয়ে হাযির হয়েছিল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং এর সংরক্ষণকারী ও বন্দোবস্তকারীকে বলেছিলেন, "যদি মূসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" সুতরাং সেখানে কোনো ওযরই কাজে আসেনি, অথচ সেটা ছিল এমন কিতাব যা মূসা 'আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন আলো হিসেবে। তাহলে সে গ্রন্থ (বিদ্যা) সম্পর্কে কী ধারণা করা যেতে পারে যা প্রণয়ন করেছে শির্কের অন্ধকারের বিচরণকারী হোঁছট খাওয়া ব্যক্তিবর্গ, যাতে তারা মিথ্যা ও অপবাদই শুধু আরোপ করেছে? হায়, আফসোস সেসব বিনষ্ট উদভ্রান্ত বিবেকদের জন্য, যারা দর্শনের পথভ্রষ্ট সমুদ্রে ডুবে আছে।[৬]

১০- বস্তুত হিদায়াত পেতে হলে অনুসরণ করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহকে। আর সেটাকে বুঝতে হবে সালাফে সালেহীনের নীতির আলোকে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা একই নীতিতে ছিলেন তাদের নীতির বাইরে যত প্রসিদ্ধ আর গণ্যমান্য লোকই বিচরণ করুন না কেন, সে পথ হিদায়াতের নয়, বিভ্রান্তির। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হিদায়াতের লোকদেরকে চিনে নেয়া, তাদের কথাকে মূল্যায়ন করা।

উপরোক্ত নীতিগুলোর আলোকে আমরা যদি 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশে উঠা' আকীদাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের নিকট কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যাবে:

**এক.** কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশে উপর উঠা' কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্যই ছিল না বরং তা ছিল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

**দুই.** সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সিফাতের অর্থ করতেন। সেসব সিফাত তারা বুঝতেন। তারা সেগুলোকে ধাঁধাঁ মনে করতেন না। তারা সেগুলোকে কখনও মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট বলতেন না। তারা 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশে উঠা'র বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। বিভিন্নভাবে তারা সেটা ব্যক্ত করেছেন।

**তিন.** তাবে'য়ীগণও আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা ও 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টিতে বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্য থেকে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের অনুসারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কেউ তা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন প্রমাণিত হয়নি।

---

৬. আদ-দেহলাওয়ী আব্দুল আযীয, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন।

**চার.** তাবে তাবে'য়ীগণের যুগ থেকে আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন মু'তাযিলারা প্রায় সকল গুণই অস্বীকার করে বসেছিল। সে সময়ে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ আলেমগণের প্রায় সবাই তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য সকল আলেমকেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুণটি সাব্যস্ত করেছেন।

**পাঁচ.** তাবে তাবে'য়ীনের পরবর্তী সময়ে এসে গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য দর্শন দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আল্লাহর গুণগুলোকে সাব্যস্ত না করার প্রবণতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখনও তাদের মধ্যে আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোকে অস্বীকার করা ব্যাপক আকারে ছিল না। যদিও তখন ইবন কুল্লাবের আকীদাহ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়ায় তখনকার বহু আলেমের মাঝে আল্লাহর কর্মগত গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে, কুল্লাবিয়্যাহ ফেরকার লোকেরা 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' অস্বীকার করতেন, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলা 'সর্বোচ্চ সত্তা', তিনি সবকিছুর উপরে থাকার বিষয়টি স্বীকার করতেন। এটাকে বলা হয় প্রাচীন আশ'আরী মতবাদ; যদিও ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী এ মতবাদ থেকে পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সালাফী আকীদায় ফিরে এসেছিলেন, তবুও তাঁর দিকেই তারা সম্পর্কযুক্ত হয়। এ কুল্যাবিয়্যাহ-আশ'আরিয়্যাহ মতবাদের প্রাচীন আলেমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, হারেস আল-মুহাসেবী, আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-ক্বালানেসী, আবু আলী আস-সাক্বাফী, আবু বকর আস-সাবগী প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আরশের উপর উঠার গুণটি স্বীকার করতেন।

**ছয়.** তাবে তাবে'য়ীনের শেষ অংশে এসে আল্লাহ তা'আলার সাতটি গুণ ব্যতীত বাকী সকল সত্তাগত ও কর্মগত গুণ অস্বীকার করার মাধ্যমে এ আশায়েরা ও তাদের প্রায় সম আকীদাহ'র মাতুরিদিয়ারা আবার নিজেদেরকে জাহমিয়্যাহদের দোসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তখনই তারা স্পষ্ট করে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সত্তা' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু তখনও হকপন্থী আলেমগণের জয়-জয়কার ছিল।

**সাত.** হিজরী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের পর থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও কর্মগত গুণগুলোকে অস্বীকার করার জন্য বেশ কিছু আলেম দাঁড়িয়ে যায়, তাদের কাছে বিবেকের যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসে। তারা এটাকেই হক মনে করে সেটার পক্ষে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের হয়ত ওযর ছিল; কারণ তারা এটাকে বিশুদ্ধ মনে করেছে। ফলে আল্লাহর সিফাত তথা গুণ অস্বীকারকারী একটি গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সব জায়গায় দেখা দেয়। তাদের দাপটে অনেক সময় আলেমগণ পর্যন্ত হক কথা বলতে পারতেন না অথবা তারা আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ'র ভুল তথ্যকেই সত্য মনে করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, ইমাম নাওয়াওয়ী, ইবন হাজার, সূয়ূতী প্রমুখ মনীষীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন। তারা এ আকীদায় বিশ্বাসী থাকলেও তারা এ আকীদাহ'র প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন এমনটি বলা যাবে না। তাই তাদেরকে সরাসরি আশ'আরী বলার কোনো সুযোগ নেই; কারণ তাদের গবেষণার ক্ষেত্র এটি ছিল না। তারা তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন।

তবে এ সময় অপর কিছু আলেম ছিল যারা এ আকীদাকে প্রমোট করা, সাব্যস্ত করা, এর প্রতি দাওয়াত দেয়া, এর জন্য গোড়ামী করাসহ সব রকমের কাজই করেছিল, তাদের অনেকেই সালাফে সালেহীনের নীতিকে মুশাব্বিহা মুজাসসিমা বলে অপমান করতে দ্বিধা করতো না।

কিন্তু হকপন্থীরা সবসময় ছিল, তারা সঠিকটিকে দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করতে পারি, তাদেরই একজন হচ্ছেন, কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর উঠার গুণে গুণান্বিত করা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের অনুসরণ, শরী'আতের প্রতি আত্মসমর্পন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সেটার সত্যায়ন।"[7] আরেকজন হচ্ছেন, ইমাম আবদুল কাদের আল-জীলানী রাহিমাহুল্লাহ, তিনি বলেন, "কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা ছাড়াই তাঁর জন্য ব্যবহার করা, আর তা হচ্ছে 'আরশের উপর তাঁর সত্তার উঠা।"[8]

তাছাড়া আরও অনেক মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ এ আকীদাহ'র জন্য সংগ্রাম করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা সে বিষয়টিকেই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।

এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে আমার প্রিয় পুত্র আব্দুর রহমান, সারাক্ষণ কিতাবপত্র সংগ্রহ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাকে কবুল করেন, তাকে দীন ও আকীদাহ'র খেদমতে নিয়োজিত করেন।

সর্বশেষে যারা এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের স্মরণ করছি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, তরুণ লেখক আব্দুল্লাহ মাহমুদ, যার অনুবাদ করা 'আল-আরশ গ্রন্থ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। তাছাড়া আমার সহকারী মাওলানা মীযানুর রহমান গ্রন্থটি পড়ে ভাষাগত সমস্যাগুলো দেখে দিয়েছি তার জন্যও দো'আ করছি।

আরও যাকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন, মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাপোর্ট দিয়ে আমাকে করেছেন প্রাণবন্ত আর গ্রন্থটি করেছেন সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য উত্তম জাযা আশা করছি।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি তিনি যেন তা কবুল করেন। এটাকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন।

**প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া**
মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
০৯/০৮/২০২০

৭. শারহু মুকাদ্দিমাতু আবু যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী।

৮. আল-গুনইয়া লি ত্বালিবীল হক্ব।

**شهدت بأن وعد الله حـــق ... وأن النار مثوى الكافرينا**
**وأن العرش فوق الماءِ طافٍ ... وفوق العرش رب العالمينا**
**وتحمله ملائكة شـــــداد ... مـــلائكـــة الإله مسومينا**

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য— আর জাহান্নাম কাফিরদের শেষ ঠিকানা। আর 'আরশের উপর রয়েছেন রব্বুল আলামীন। আর নিশ্চয় 'আরশ তা তো পানির উপর ভাসছে। আর সে 'আরশকে বহন করছে শক্ত-সামর্থ্য আল্লাহর নিশান লাগানো ফিরিশতগণ।"

**-আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু**

# প্রথম অধ্যায়
# আল্লাহ তা‘আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকীদাহ

## প্রথম পরিচ্ছেদ
## “ইস্তেওয়া আলাল ‘আরশ” সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা‘আলার সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে জানা ও মানা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইলম ও সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞান। এর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করার সুযোগ কোথায়। দুনিয়ায় যারা এসেছে তারা যদি এ জ্ঞান অর্জন না করে তাহলে সে জাহেল থেকেই যাবে। এ জ্ঞান অনুযায়ী অজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাপকাঠি নির্ধারিত হবে। এ জ্ঞান যার কাছে যত বেশি, যার কাছে যত বিশুদ্ধ তিনি তত বড় আলেম হিসেবে বিবেচিত হবেন। কারণ, এ জ্ঞান অর্জন মানেই তাওহীদের জ্ঞান অর্জন। আল্লাহর সত্তা ও কর্ম সম্পর্কে জানার অপর নাম তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বে তাওহীদ। তাঁর নাম ও গুণ জানা, মানা ও সেগুলোর যথাযথ উপলব্ধি অন্তরে জাগরুক রাখা, সেগুলো দিয়ে তাকে ডাকাই হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণে তাওহীদ। আর তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে একমাত্র তাঁর জন্যই মানুষদের সবকিছু নিবেদিত হওয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে তাওহীদ। তন্মধ্যে সবচেয়ে শরীফ ও সম্মানিত অংশ হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। আল্লাহর নেককার বান্দাগণ তাঁর নাম ও গুণের মাধ্যমেই তাঁর ইবাদাত করে, আর এ নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ সেগুলো দিয়েই তোমরা তাকে ডাক।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] তাঁর রয়েছে উত্তম সিফাত বা গুণাবলি, আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [الروم: ٢٧]

“আর আসমান ও যমীনে উত্তম গুণাবলি তো তাঁরই।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭] সুতরাং যারা তাঁর নাম ও তাঁর গুণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছে তারাই রাব্বুল আলামীনকে চিনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, কোনো কিছুকে জানতে হলে হয় তাকে দেখতে হবে, যা আল্লাহর জন্য দুনিয়ার জীবনে অসম্ভব অথবা কাউকে জানতে হলে তার মতো কাউকে দেখতে হবে, কিন্তু তাঁর মতো তো কেউ নেই,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] বাকী থাকলো তাঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ। আল্লাহকে জানতে হলে, তাঁর সঠিক পরিচিতি পেতে হলে তাঁর দেয়া গ্রন্থ এবং তাঁর সম্পর্কে যারা সত্য সংবাদ বাহক রয়েছেন তাদের দেয়া সংবাদের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য, আর তাঁর সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলো নবী-রাসূলগণ যা যা বলেছেন তাই সত্য। সেগুলো

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিবেকে ধরতেও পারে আবার নাও ধরতে পারে। কারও ব্যক্তি বিশেষের বিবেকের যুক্তি দিয়ে সেগুলোর সত্য-মিথ্যা হওয়া কখনও নির্ভর করবে না। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হলে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বাণীর ওপরই নির্ভর করতে হবে। বিবেকের যুক্তিকে বলতে হবে, তার সীমাবদ্ধতা আছে, সে অনেক কিছু বুঝতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ সত্য, তাঁর নবী-রাসূলদের দেয়া সংবাদ সত্য। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখনকার দো'আয় বলতেন, "হে আল্লাহ.. আপনি হক্ব, .. আপনার কথা হক্ব, নবীগণ হক্ব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক্ব"।[9] বস্তুত আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন, হাদীস নির্ভর হওয়ার বিকল্প আগেও কোনো দিন ছিল না, আর না কোনো দিন পাওয়া যাবে।

সে কুরআন ও হাদীসকে জানতে হলে, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হলে সর্বকালের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বসমূহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের মত ও পথ ছাড়া আর কোনো পথ থাকতে পারে না। যারাই সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ী ও ইসলামের সম্মানিত ইমামগণের পথে চলবে তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। এ পথে চলার জন্য আমাদেরকে নবীর পক্ষ থেকে নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, আমার উম্মত বহু দলে বিভক্ত হবে, তখন সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, এর থেকে বাঁচার পথ কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছিলেন, "যার ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবীগণ আছেন"।[10] তিনি তাদেরকেই 'আল-জামা'আহ' বলে ঘোষণা করেছিলেন[11], সাহাবায়ে কেরামের পথকে আঁকড়ে ধরতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তারা ঈমান আনে তোমরা যে রকম ঈমান এনেছ তবে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে"।[12] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য তাঁর সাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম হচ্ছে আমার প্রজন্ম"।[13] তিনি আরও বলেছেন,

«النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»

"তারকাসমূহ আকাশের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করছে, যখন তারকাসমূহ খসে যাবে তখন আকাশের বিপদ আসন্ন। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে রয়েছি, আমি যখন চলে যাব তখন আমার সাহাবীদের বিপদ আসবে। আর আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার কারণ; তারা যখন চলে যাবে তখন আমার উম্মতের জন্য বিপদ এসে যাবে।"[14] সুতরাং যাবতীয় ফিতনা ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে নিরাপত্তা পেতে হলে সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

---

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২০, ৬৩১৭।

১০. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪১।

১১. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯৩।

১২. সূরা বাকারাহ: ১৩৭; অনুরূপ সূরা নিসা: ১১৫; তাওবাহ: ১০০; সূরা ইউসুফ: ১০৮; সূরা ফাতহ: ২৯।

১৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩।

১৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩১।

শুধু কুরআনুল কারীম মানলেই চলবে না; কারণ যুগ যুগ ধরে বাতিল ও বিদ'আতপন্থীরা কুরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করার অশুভ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আজও আমরা দেখতে পাই শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া, সুন্নাহ অস্বীকারকারী এমনকি কাদিয়ানীরা পর্যন্ত কুরআন দিয়ে দলীল দেয়। যদিও তারা কুরআনের আয়াতসমূহের এমন সব ব্যাখ্যা দাঁড় করায় যা তাদের উৎপত্তির পূর্বে কেউ কোনো দিন শুনেনি। রাসূল বলেননি, সাহাবায়ে কেরাম এমন তাফসীর করেননি, উম্মতে গ্রহণযোগ্য মুফাসসিররাও কোনো দিন নিয়ে আসেনি।

কুরআনের সাথে সহীহ সুন্নাহকেও নিতে হবে। সহীহ সুন্নাহ একদিকে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানের বাখ্যা, অপরদিকে তা অনেক নতুন শর'য়ী বিধান প্রদান করেছে। ইসলামের বহু ফরয শুধু সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ত্রিশোর্ধ্ব জায়গায় রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আনুগত্য না করার শাস্তি কী হবে তা জানিয়ে সাবধান করেছেন। তাছাড়া রাসূল নিজেও বলেছেন,

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

"সাবধান, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে আর কুরআনের সাথে তার অনুরূপ আরও কিছু দেয়া হয়েছে।"(15)

তবে কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝতে হবে সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী; কারণ তারা এগুলোর আমল সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়েছেন। তারা হিদায়াতের ওপর ছিলেন, হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আকীদাহ ও আমলে তারা আমাদের আদর্শ। তাদেরকে যারা আদর্শ হিসেবে মানবে না তারা সঠিক পথ থেকে হবে বিচ্যুত। যুগে যুগে যখনই কোনো বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটেছে তখনই সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ উম্মতকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামই হচ্ছেন আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরী। আজও আমরা এ দাওয়াতই দিয়ে থাকি। এ দাওয়াতই হচ্ছে সালাফী দাওয়াত। সঠিক মত ও পথে থাকতে হলে আকীদাহ ও আমলে সাহাবায়ে কেরামের পথ ও মত অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। সাহাবায়ে কেরাম কোথাও একমত হলে তা হবে ইজমা' বা অকাট্য বিষয়, যার বিপরীত করা পথভ্রষ্টতা। আর সাহাবায়ে কেরাম কোথাও মতভেদ করলে, সেখানে যদি মীমাংসাকারী হিসেবে কুরআন বা সহীহ হাদীসের বাণী না থাকে, তবে সেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য আমাদের জন্য প্রশস্ততা নিয়ে এসেছে। সেখানে যেকোনো একটিকে অনুসরণ করলেই উম্মতের হিদায়াত নিশ্চিত থাকবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছিলেন, 'যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে আসবে, তা আমার মাথা ও চোখের উপর রাখব। আর যাতে সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য করেছেন আমি তার বাইরে যাবো না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেখানে আমি তাদের কথা থেকে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করে নিব।'(16)

আকীদাহ'র বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীন ও হিদায়াতের ইমামগণের মতের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এগুলোতে কোনো

১৫. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭১৭৪।

১৬. আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল বাইহাক্বী।

ইজতিহাদ কাজ করবে না। কারণ, আকীদাহ’র বিষয়গুলো সকল নবীর সময়েই একই রকম ছিল। নতুন করে কোনো আকীদাহ যোগ হবে না। তবে আকীদাহ’র বিষয়ে কারও কারও কাছে নতুন করে সমস্যা আসলে সেটার সমাধান কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে বুঝে নিতে হবে।

আকীদাহ’র যে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে‘য়ীন ও ঈমামগণের কথার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তন্মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছে আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি। আল্লাহর জন্য কোন নামটি সাব্যস্ত হবে, কোনটি সাব্যস্ত করা যাবে না, কোন গুণটি সাব্যস্ত হবে আর কোন গুণটি সাব্যস্ত করা যাবে না তা এ নীতির আলোকেই নির্ধারিত হবে।

আজকে আমরা যে বিষয়টির আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে, আল্লাহর ‘আরশের ওপর ‘ইস্তেওয়া’ বা ‘আরশের উপর উঠার গুণটি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি

আমরা আল্লাহর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে উত্তম হবে, আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর রয়েছে অনেক নাম ও অনেক গুণ। সেগুলো সাব্যস্ত হবে বেশ কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে।

### আল্লাহর নামের ব্যাপারে নীতিমালাসমূহ:

- আল্লাহর সকল নামই অতি সুন্দর, চাই সে নামটি এক শব্দে হোক অথবা সংযুক্ত শব্দে হোক অথবা হোক পাশাপাশি কয়েক শব্দের সংমিশ্রণে।
- আর আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: নামের প্রতি ঈমান, নামের নির্দেশিত অর্থের প্রতি ঈমান এবং নামের চাহিদা ও দাবিকৃত প্রভাবের প্রতি ঈমান। যেমন, সে বিশ্বাস করবে যে, তিনি عليمٌ (মহাজ্ঞানী), ذو علم محيطٍ (অসীম জ্ঞানের অধিকারী) এবং أنه يُدبّرُ الأمر وفقَ علمه (তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)।
- আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর, যা পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ দ্বারা নাম ও গুণ সাব্যস্ত করে। তবে যখন নাম বুঝায় তখন তা একই সত্তার নাম হিসেবে সমার্থে কিন্তু যখন তা দ্বারা গুণ বুঝায় তখন তাঁর নামসমূহে নিহিত গুণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাঁর গুণাবলির প্রতিও নির্দেশ করে। কারণ, নামগুলো তাঁর কিছু গুণাবালি থেকে নির্গত।
- আর তাঁর নামের সংখ্যা ৯৯ (নিরানব্বই)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং তা গণনাকারীগণের গণনায় সীমাবদ্ধ করা যাবে না।
- আর আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি নামই শ্রেষ্ঠ-মর্যাদাপূর্ণ; কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর।
- আর যখন তাঁর কোনো নাম গঠন কাঠামোতে ভিন্ন হয় এবং অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হয়, তখন তা আল্লাহর নামসমূহ থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন- গাফূর ও গাফফার।
- এ (নামগুলোর) ক্ষেত্রে অবিশ্বাস বা বিকৃতিকরণ বলে গণ্য হবে-

- তা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হওয়ার পর অস্বীকার করা
- অথবা তা যা নির্দেশ করে, তা অস্বীকার করার দ্বারা।
- অনুরূপভাবে তা গঠন ও তৈরি করার ক্ষেত্রে নতুন মত প্রবর্তন করা।

- অথবা সে নামগুলোকে সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ও গুণাবলির সাথে উপমা দেয়ার দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

"আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদেরকে বর্জন করুন। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০]

## আল্লাহর মহান গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি মহান, প্রশংসনীয়, পরিপূর্ণ এবং তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর।
- নামসমূহ থেকে গুণাবলির বিষয়টি অনেক বেশি প্রশস্ত, আর তার চেয়ে আরও বেশি প্রশস্ত ও ব্যাপক হলো আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে কোনো সংবাদ প্রদান।
- আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহ তাঁর নাম ও গুণ থেকে উত্থিত। প্রতিটি কর্ম কোনো না কোনো নাম বা গুণের প্রভাব।
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে কেউ পুরাপুরিভাবে অবহিত নয় এবং তার ব্যাপারে পরিপূর্ণ কোনো হিসাব বা ধারণাও করে শেষ করা যায় না, আর এগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, যা কোনো রকম কমতি বা ঘাটতি দাবি করে না, এগুলোর অংশবিশেষের ব্যাখ্যা হয় অপর অংশ বিশেষের দ্বারা, যা এক রকম হওয়া দাবি করে না।
- আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর জন্য সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে দু' প্রকার:
  - আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কিছু গুণ হ্যাঁ-বাচক বা সাব্যস্তকরণের,
  - আবার কিছু গুণ না-বাচক বা অসাব্যস্তকরণের বা নিষেধসূচক।
- আল্লাহর সাব্যস্তকৃত গুণাবলিসমূহ দু' প্রকার: নিজস্ব সত্তাগত এবং কর্মগত। এগুলো সবই প্রশংসনীয় ও পরিপূর্ণ।
- **সত্তাগত গুণাবলি:** চিরন্তন ও স্থায়ীভাবে তা সাব্যস্ত। আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কল্পনাই করা যায় না এবং তা না থাকাটা এক প্রকার ত্রুটি ও কমতিকে আবশ্যক করে (যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়), আর তা ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথেও সম্পর্কিত নয়। কর্মবাচক গুণাবলি এর বিপরীত। সত্তাগত গুণাবলি দুইভাবে সাব্যস্ত হবে:
  - **কিছু নীতিগতভাবে সাব্যস্ত (সাধারণভাবে সাব্যস্ত করা যায়, শ্রুত দলীলের প্রয়োজন হয় না। তারপরও তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে):** যেমন, জীবন, ইচ্ছা, শ্রবণ, দেখা, শক্তি, জ্ঞান, সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ইত্যাদি।
  - **আর কিছু হলো খবর থেকে প্রাপ্ত বা তথ্যগত: যদি কুরআন ও হাদীসে না আসতো আমরা তা কখনও সাব্যস্ত করতে পারতাম না।** যেমন, মুখমণ্ডল বা চেহারা, দু'হাত, পা, দু' চোখ, আঙ্গুল, পিণ্ডলী ইত্যাদি।
- **কর্মবাচক গুণাবলি:** যেমন, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, হাশরের মাঠে আগমন করা, প্রথম আসমানে নেমে আসা, 'আরশের উপরে উঠা ইত্যাদি যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। যখন ইচ্ছা

তখন তিনি তা করেন। আর তা দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- লাযেম বা যা একান্তভাবে তাঁর নিজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, প্রথম আকাশে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আগমন।
- মুতা'আদ্দি বা যা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন সৃষ্টি করা, দান করা, নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি

- **নেতিবাচক বা না-সূচক গুণাবলি:** যেমন, মৃত্যু, ঘুম, ভুলে যাওয়া, দুর্বলতা বা অক্ষমতা ইত্যাদি।
- নেতিবাচক গুণাবলির মধ্যে কোনো প্রকার পরিপূর্ণতা ও প্রশংসার বিষয় নেই, তবে এগুলোর বিপরীত গুণাবলি যখন সাব্যস্ত করা হবে তখন তা পরিপূর্ণ ও প্রশংসার বিষয় হবে। যেমন- মৃত্যু নেতিবাচক গুণ যা তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু যখন তার বিপরীত 'হায়াত' বা চিরঞ্জীব সাব্যস্ত করা হবে তখনই তা হবে প্রশংসামূলক এবং পরিপূর্ণতার ওপর প্রমাণবহ।
- গুণাবলির ব্যাপারে ওহীর পদ্ধতি হলো: নেতিবাচকের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং ইতিবাচকের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে।
- গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা নামসমূহের ব্যাপারে কথা বলার মতোই, আর গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা সত্তার ব্যাপারে কথা বলার মতোই। গুণাবলি সাব্যস্ত করতে কারও সমস্যা হলে বলা হবে, যদি সত্তা সাব্যস্ত করতে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা না হয় তাহলে গুণ সাব্যস্ত করতেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- কিছুসংখ্যক গুণাবলির ব্যাপারে যে মতামত ব্যক্ত করা যায়, বাকি গুণাবলির ব্যাপারেও একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করা যায়। অর্থাৎ কিছু গুণ সাব্যস্ত করতে যদি সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অপর গুণাবলির ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- আল্লাহর নামসমষ্টি ও গুণাবলির সাথে সৃষ্টির নাম ও গুণাবলি একই রকম শব্দ হলেই তা নামকরণকৃত ও বিশেষিত বিষয়সমূহের এক রকম হওয়াকে জরুরি করে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সামী' বলেছেন, বাসীর বলেছেন; অন্যদিকে তিনি তার বান্দাকেও সামী' ও বাসীর বলেছেন। কিন্তু উভয় সামী' ও বাসীরের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। সুতরাং শুধু বান্দার নাম বা গুণের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নাম ও গুণকে অস্বীকার করা যাবে না।
- বিবেকের যুক্তিতে এমন কিছু নেই যা আল্লাহর নাম ও গুণকে প্রমাণ করার বিরোধিতা করে।
- গুণাবলি সংক্রান্ত ভাষ্যগুলোর ব্যাপারে আবশ্যকীয় কাজ হলো, সেগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা যা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও মর্যাদার সাথে মানানসই এবং যা সম্বোধন ও বর্ণনার চাহিদার সাথে সুনির্দিষ্ট, আর যা বুঝা যাবে বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে।
- সুতরাং নাম ও গুণাবলি যখন রবের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হবে, তখন তা তাঁর সাথে সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তাঁর সত্তা সাব্যস্ত হবে অন্য সত্তার মতো করে নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সকল নাম ও গুণাবলিও সাব্যস্ত করা হবে, যার সাথে সৃষ্টির কোনো নাম অথবা গুণের

মিল বা তুলনা করা হবে না।

- যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও কার্যাবলি সাব্যস্ত করাটি বাস্তব অর্থেই, ঠিক অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত করাও বাস্তব অর্থেই নিতে হবে।
- পরবর্তী লোকদের কাছে পরিচিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা 'নাম ও গুণের অর্থ না করে যেভাবে তা এসেছে সেভাবে ছেড়ে যাওয়া' নীতি অবলম্বন করা হলে তার দ্বারা প্রকৃত অর্থকে বাদ দেয়া হয়। তাই সেটি নিকৃষ্ট বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত; তবে যদি তাফওয়ীদ্ব (বা যেভাবে এসেছে সেভাবে ছেড়ে দেয়া) দ্বারা প্রকৃত বাহ্যিক অর্থ করার তার 'ধরণ' সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তবে তা সঠিক নীতি।
- কিবলার অনুসারী দল ও গোষ্ঠীগুলোর মাঝে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতটি মধ্যমপন্থার প্রতিনিধিত্বকারী। তা হলো: তা তুলনাহীনভাবে সাব্যস্তকরণ এবং অর্থশূন্যতাহীন পবিত্রকরণ; কারণ প্রত্যেক (আল্লাহর নাম ও গুণের সাথে) তুলনাকারী ব্যক্তিই অর্থশূন্যকারী এবং সে ঐ ব্যক্তির মতো যে মূর্তিপূজা করে। আর প্রত্যেক (আল্লাহর নাম ও গুণকে) অর্থশূন্যকারী ব্যক্তিই তুলনাকারী এবং সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অস্তিত্বহীনের পূজা করে।
- আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করা কুফুরী, সৃষ্টিরাজির সাথে সেগুলোর তুলনা ও উপমা সাব্যস্ত করাটাও কুফুরী।
- পরবর্তী লোকদের অপব্যাখ্যা ধ্বংসের আলামত; ব্যাখ্যা তো শুধু তখনই করা যাবে যখন প্রকাশ্য অর্থ করলে তা কুরআন-হাদীসের সকল বর্ণনার পরিপন্থী হয়। তখন সে প্রকাশ্য অর্থের ব্যাখ্যা করা হবে এমন কিছু দিয়ে যা কুরআন-হাদীসের সে ভাষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে।
- আল্লাহর গুণাবলির অপব্যাখ্যা করার নীতিই হচ্ছে বিদ'আতী মূলনীতি, আর তার কোনো কোনোটির ব্যাখ্যা করা জ্ঞানগত ত্রুটি, যা তার প্রবক্তার ওপর নিক্ষিপ্ত হবে।[১৭]

১৭. এ অধ্যায়ে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীনের আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা দেখা যেতে পারে। অনুরূপ আরও দেখা যেতে পারে, ড. মুহাম্মাদ ইউসরী মুহাম্মাদ এর দুররাতুল বায়ান।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ফেরকাসমূহের নীতি

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে যেসব ফেরকাসমূহ সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদেরকে আমরা মৌলিকভাবে দু'ভাগ করতে পারি:

**প্রথম দল: মু'আত্তিলা বা নাম ও গুণকে অর্থশূন্যকারী সম্প্রদায়।**

মু'আত্তিলা সম্প্রদায় দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত:

**এক. ঘোর মু'আত্তিলা। আর তারা হচ্ছে তথাকথিত দার্শনিক সম্প্রদায়:**

এরা কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১- **নাম ও গুণ অস্বীকারকারী দার্শনিক সম্প্রদায়:** এদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ইবন সীনা ও তার মতো লোকেরা। তারা মনে করেন যে, আল্লাহর অস্তিত্ব শুধু নাম মাত্র। যার কোনো নাম ও গুণ থাকতে পারে না। তারা যাবতীয় নেতিবাচক নাম ও গুণ তাঁর জন্য ব্যবহার করে থাকে। বস্তুত এরা যে আল্লাহর চিন্তা করে সেটা শুধু চিন্তাজগতেই সীমাবদ্ধ। বাইরে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত তারা করতে পারে না।

২. **নাম ও গুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা অবলম্বন ও হ্যাঁ বাচক কিংবা না বাচক উভয়টি বলতে অস্বীকার করার নীতিতে বিশ্বাসী দার্শনিক সম্প্রদায়:** এরা হচ্ছে কারামিত্বা ও বাতেনী ফেরকার দার্শনিক লোকেরা। তারা বলে, আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে আমরা জানবোও না, আবার জানাবোও না। হ্যাঁও বলবো না, নাও বলবো না। তারা বলে, তিনি জীবিত কিংবা মৃত, সক্ষম কিংবা অক্ষম কোনোটিই তাকে বলা যাবে না। কারণ, তা সাব্যস্ত করলে যাদের গুণ রয়েছে তাদের মতো হয়ে যায়, আর যদি সাব্যস্ত না করি তবে যাদের গুণ নেই বলা হয় তাদের সাথে মিশে যায়। সুতরাং কোনোটিই বলবো না, যাতে করে কারো সাথে সাদৃশ্য বিধান না হয়।

৩. **আজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়:** যারা বলে, আমরা তার ব্যাপারে কিছুই জানি না আর জানার প্রয়োজনও মনে করি না। তিনি জীবিত কিংবা মৃত এ জাতীয় কিছুই আমরা জানি না। এরা মূলত আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেই নারাজ। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার, তাঁর পরিচয় জানা, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর ইবাদাত করা ও তাঁকে আহ্বান করা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। কোনো কোনো আলেম তা হাল্লাজের মতো বলে বর্ণনা করে থাকেন।

৪. **ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়:** যারা বলে সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। সুতরাং উভয় অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। তাই স্রষ্টার আলাদা গুণ থাকে কী করে? তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বলে বর্ণনা করা হয় প্রখ্যাত সূফী ইবন আরাবী আল-হাতেমীকে। তাই সে বলতো, জগতে যত কথা আছে সবই তো তারই কথা, সেটা গদ্য হোক কিংবা পদ্য। এ মতের সমর্থকদের অন্যতম হচ্ছে ইবন সাব'ঈন, ইবন হূদ, তিলমিসানী, আবদুল কারীম আল-জীলী, সোহরাওয়ার্দী। পরবর্তীদের মধ্যে রূমী, আত্তার প্রমুখ।

**দুই. কিছু বা সকল নাম ও গুণ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়, আর এরা হচ্ছে আহলুল কালাম বা কালামশাস্ত্রবিদ ও তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়:**

তারা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত:

১- **জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়:** যারা জাহম ইবন সাফওয়ান এর অনুসারী। নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে,

- আল্লাহর সকল নাম অস্বীকার করা।
- শুধু স্রষ্টা ও সক্ষম এ দু'টি নাম দেয়া যেতে পারে।
- আল্লাহর কোনো গুণ থাকতে পারে না। যদি দিতেই হয় তো না সূচক গুণ বলা যাবে। বস্তুত এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে শুধু চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ করে, বাইরে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২- **মু'তাযিলা সম্প্রদায়:** তাদের সাথে যুক্ত হবে, নিজারিয়া, দ্বারারিয়্যাহ, রাফেদ্বীয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়, যায়দিয়া শিয়া সম্প্রদায়, ইবাদ্বিয়া খারেজী সম্প্রদায়, ইবন হাযম ও অন্যান্যরা। আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের নীতি হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণ অস্বীকার করা।
- তাদের কোনো কোনো সম্প্রদায় বলেন, তিনি স্বয়ং জ্ঞানী সত্তা তবে জ্ঞান ব্যতীত। তার জ্ঞান অর্থই তার সত্তা। এভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সম্পন্ন আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করে থাকে।
- তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর একটি গুণ আছে, যা হচ্ছে প্রাচীনত্ব। আর প্রাচীনত্ব হবে তখনই যখন তার সাথে কোনো পরবর্তী কিছু যুক্ত হবে না। সেটাই হচ্ছে 'জাওহার' [Essence] (সারবস্তু বা নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা)। কোনো গুণ সাব্যস্ত করলে আল্লাহর সাথে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। কারণ, এ গুণগুলো হচ্ছে 'আরদ্ব' [Accident] (অনিত্যসত্তা, বা পরিবর্তনশীল সত্তা)। জাওহার বা মৌলিক আল্লাহর সাথে যৌগিক কিছু সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা, যাতে কোনো কিছু যুক্ত হয় তা তার মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব হারায়। সুতরাং আল্লাহকে প্রাচীন সাব্যস্ত করতে হলে তার সকল ধরনের গুণ অস্বীকার করতেই হবে। আর এটাই তাদের নিকট তাওহীদ।
- তাদের মতে স্রষ্টার সাথে কোনো কিছুর সম্পর্ক হতে পারে কেবল সৃষ্টি হিসেবে, স্রষ্টার গুণ হিসেবে নয়। এ কারণেই তারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে। সেজন্য তারা ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট সময় মুসলিমদের ওপর তাদের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছিল।
- তাদের নিকট আল্লাহর নামগুলোর কোনো অর্থ নেই। সেগুলো দিয়ে কেবল একজন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।
- তাদের নিকট স্রষ্টাকে দেখা যাবে না। কারণ, দেখা গেলে তো দিক লাগবে। আর যা দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তা কখনো নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা (কাদীম, জাওহার) হতে পারে না। সুতরাং তাকে দেখা যাবে না।